দৈনিক ইত্তেফাক
প্রতিষ্ঠাতা তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া
আজ মঙ্গলবার
৩২ পৃষ্ঠা
মূল্য ১২.০০ টাকা
THE DAILY ITTEFAQ
২৩ ডিসেম্বর ২০২৩

বঙ্গভবন কিল আসলে ব্রিটিশদের সবকের সেনাদের লড়াই হবে পৃষ্ঠা ৭
দুই ঘুলাদের রাজকুমা পৃষ্ঠা ১২
বিক্ষোভে উত্তাল দার্জিলিং পৃষ্ঠা ১১
কিংসের কাছে, খবর মেয়েরা গোপাল মিটিং করেছে পৃষ্ঠা ১০

ড. আতিউর রহমান

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা

১৯১১ সালে যখন বঙ্গভঙ্গ রদ হয়ে গেল তখন এই পূর্ব বাংলার মধ্যবিত্তদের মধ্যে একধরনের ক্ষোভ ছিল। সেই ক্ষোভ নিরসনের জন্য ব্রিটিশরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় যাদের অবদান খুব গুরুত্বপূর্ণ তাদের মধ্যে তিনিও ছিলেন। আরো ছিলেন নওয়াব আলী, শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক ও স্যার সলিমুল্লাহ। তাদের সঙ্গে মিলে তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য বহুমাত্রিক কাজ করেছেন। আর আমরা তো জানি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরবর্তীকালে আমাদের জাতিসত্তা, আমাদের ভাষা আন্দোলন এবং বাংলাদেশ সৃষ্টির একটি কেন্দ্রবিন্দুতে রূপান্তরিত হয়েছিল

খানবাহাদুর আহছানউল্লা (র.) ছিলেন একজন বড় মাপের শিক্ষক, শিক্ষা সংস্কারক, শিক্ষা প্রশাসক এবং একই সঙ্গে সাধক।

তিনি পূর্ব বাংলার খুলনায় জন্মগ্রহণ করেন। তবে বেশির ভাগ লেখাপড়া করেছেন কলকাতায়। কলকাতার লন্ডন মিশন সোসাইটি স্কুল, প্রেসিডেন্সি কলেজ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। এরা ডাকসাইটে ব্যক্তি করেন পূর্ব বাংলায় রাজশাহীর কলেজিয়েট স্কুলে সুপার নিমারারি টিচার হিসেবে। তারপর তিনি পূর্ব বাংলার নানা প্রান্তে শিক্ষা প্রশাসক হিসেবে অ্যাসিস্টেন্ট ডিপিআই এবং ডিপিআই হিসেবে কাজ করেছেন। তিনি বেশির ভাগ কাজ করেছেন চট্টগ্রাম ও সুমিয়া এলাকায়। এ সময় তিনি অসংখ্য প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন। কত স্কুল যে তিনি গড়ে তুলেছিলেন, সেটা হয়তো খুব শেষ করা যাবে না। কলেজ গড়ার ক্ষেত্রেও তাঁর অবদান অপরিসীম। বিশেষ করে, কলকাতায় ইসলামিয়া কলেজ গড়ার সময়ে তিনি বড় ভূমিকা পালন করেছেন। এই কলেজেই বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পড়াশোনা করেছেন। এই কলেজের বেকার হোস্টেলটিও গড়ার জন্য তিনি বড় ভূমিকা পালন করেছেন। এবং পরবর্তে উল্লেখ করার মতো ভূমিকা রেখেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সময়।

ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ার লক্ষ্যে যে নানান কমিশন তৈরি হয়েছিল তার একটি সাবকমিটির সদস্য ছিলেন খানবাহাদুর আহছানউল্লা (র.)। পরবর্তীকালে ব্রিটিশ সরকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আইন তৈরি করার জন্য ৯ সদস্যের যে কমিটি করেছিলেন সেই কমিটিরও তিনি একজন সদস্য ছিলেন। তিনি আজীবন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য কাজ করেছেন। এই দুটো বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনি সিনেট সদস্য ছিলেন। সেই সময়ের পূর্ব বাংলার শিক্ষা ও অর্থনীতি অনেক অনগ্রসর ছিল। বিশেষ করে, শিক্ষাক্ষেত্রে আমাদের অনগ্রসরতা ছিল প্রকট। এবং এই সমস্যাটি তিনি লক্ষ করেছিলেন যে, পূর্ব বাংলায় সত্যি সত্যি যদি উন্নয়ন করতে হয়, যদি কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে হয়, তাহলে শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়ন করতে হবে। এজন্য পূর্ববাংলায় অসংখ্য মাদ্রাসা, স্কুল ও কলেজ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তার ভূমিকা ছিল অপরিসীম এবং শিক্ষাক্ষেত্রেও তিনি অসাম্প্রদায়িক সংস্কারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। যেমন একসময় মাইনর, মিডল ও এনএন সব পরীক্ষায় আগে নাম লেখা হতো। নাম লেখা থাকত হিন্দু ও মুসলিম ছেলেমেয়ে সবই আলাদা ছিল। সুতরাং, তিনি প্রস্তাব করলেন পরীক্ষার খাতায় নাম থাকবে না। শুধু রোল নাম্বার থাকবে এবং এই সংস্কারটি ছিল খুব গুরুত্বপূর্ণ ও আধুনিক পদক্ষেপ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সার্বিকভাবে পূর্ব বাংলার যে মধ্যবিত্ত, সেই মধ্যবিত্ত গড়ে তোলার জন্য এই বিশ্ববিদ্যালয়টির ভূমিকা ছিল অপরিসীম। ১৯১১ সালে যখন বঙ্গভঙ্গ রদ হয়ে গেল তখন এই পূর্ব বাংলার মধ্যবিত্তদের মধ্যে একধরনের ক্ষোভ ছিল। সেই ক্ষোভ নিরসনের জন্য ব্রিটিশরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় যাদের অবদান খুব গুরুত্বপূর্ণ তাদের মধ্যে তিনিও ছিলেন। আরো ছিলেন নওয়াব আলী, শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক ও স্যার সলিমুল্লাহ। তাদের সঙ্গে মিলে তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য বহুমাত্রিক কাজ করেছেন। আর আমরা তো জানি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরবর্তীকালে আমাদের জাতিসত্তা, আমাদের ভাষা আন্দোলন এবং বাংলাদেশ সৃষ্টির একটি কেন্দ্রবিন্দুতে রূপান্তরিত হয়েছিল। সুতরাং, এই বিশ্ববিদ্যালয়টি আমাদের স্বাধীনতার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। সেই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় তিনি বড় ধরনের ভূমিকা রেখেছেন।

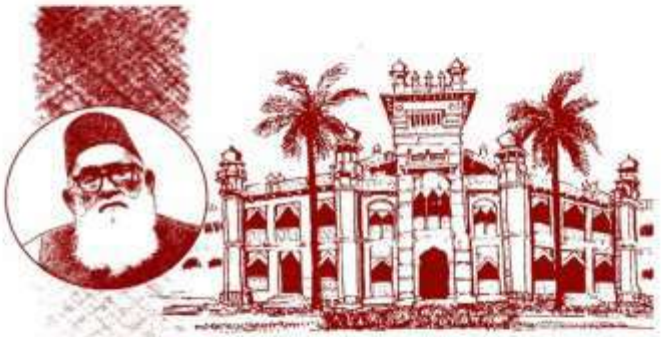

তিনি শুধু শিক্ষা সংস্কারক বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতাই ছিলেন না। ছিলেন তিনি একজন ভালো লেখকও। অসংখ্য বই তিনি লিখেছেন এবং অনেক অসংখ্য বইও প্রকাশ করেছেন তার প্রকাশনী থেকে। তিনি মধ্যপূর্ব লাইব্রেরিটি স্থাপন করেছিলেন এবং পরবর্তীকালে তিনি তার আহছানউল্লা বুক ষ্টল লিমিটেড থেকে আমাদের দেশের অসংখ্য বিখ্যাত উপন্যাস, যেমন—আচাম্বিত, বিষাদ-সিন্ধু, কাজী নজরুল ইসলামের কুহেলিকা, কাব্যেটি, কাব্যে আমপারা; মধু আদর শপথুথীদের পরিচালক ছাপী প্রকাশ করেছিলেন। এসব বই প্রকাশ করে তিনি এই পূর্ব বাংলায় শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মানস গঠনে ও মুসলিম সাহিত্যচর্চায় অনুপ্রেরণা এবং সহায়তা করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

এই সমস্তটায় তিনি তার সুন্দর প্রতিষ্ঠান আহছানিয়া মিশন নিয়ে প্রায় পাহাড়ীরার লড়াই শুরু করেছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি ঢাকায় এসে ঢাকা আহছানিয়া মিশন নামেও একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। আমরা সবাই জানি, প্রতিষ্ঠান খুব গুরুত্বপূর্ণ। একলা মানুষ টুকরা যায়। কিন্তু অনেকে মিলে একটি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সমাজ, সংস্কৃতি ও অর্থনীতি উন্নয়ন করা যায়।

আমি গভর্নর হিসেবে যখন বাংলাদেশের অর্থনীতি খাতের সঙ্গে জড়িত ছিলাম তখন দেখেছি আহছানিয়া মিশনের ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্যাংক বড় ভূমিকা পালন করেছে। আমি তাদের উৎসাহিত করেছি। আমার প্রশংসাও, পদকার ইত্তিমি গড়ানো পুরো গুরুত্ব দিয়ে এই প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তোলার জন্য তার নিজের পুরানো ব্যাংক ও অন্যান্য ব্যাংকগুলোকে উৎসাহিত করেছেন। সুতরাং, খানবাহাদুর আহছানউল্লার মতো এই শিক্ষাবিদ ও সংস্কারক খুব স্বাভাবিকভাবেই আমাদের এই পূর্ব বাংলার মধ্যবিত্তদের মনে স্থান অছেন। সেই জন্য তিনি পুরস্কৃতও হয়েছেন। বাংলা একাডেমির সম্মাননাসূচক ফেলোশিপ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের মরণোত্তর পুরস্কারে তিনি ভূষিত হন। তাছাড়া তার প্রতিষ্ঠিত ঢাকা আহছানিয়া মিশন স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার অর্জন করে।

তাই তাকে বারবারই স্মরণে আনা দরকার। তিনি সেই সব জায়গায় কাজ করেছেন যেখানে কাজ করলে মানুষের মনের গণ্ড প্রসন্ন ঘেলা যায়। শিক্ষাই মানুষের মন ও মননের পরিবর্তন ঘটায়। শিক্ষা ও জীবন আলাদা হতে পারে না। সে কারণেই একটি মানবিক ও অর্থনীতি সমৃদ্ধ সমাজ বিনির্মাণের জন্য তিনি সব সময় কাজ করেছেন শিক্ষা নিয়ে। শিক্ষার প্রসারে তিনি অনেক গুরুত্ব দিয়েছেন। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ার জন্য তিনি নিরলস কাজ করেছেন। এই কারণে আমাদের এই পূর্ব বাংলায় তার মতো উদারপুরি তারা এখনো তাকে স্মরণ করে শিক্ষার ক্ষেত্রে তার অবদান এবং সংস্কারের জন্য।

আমি জোর দিয়ে বলতে পারি যে, ঢাকা আহছানিয়া মিশন বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে ত্রিশেরও বেশি পানিবাহনুর আহছানউল্লার ১৫০তম জন্মবার্ষিকী পালন করছে। এই জন্মবার্ষিকী উদযাপনকে কেন্দ্র করে তার অবদানগুলো সবার সামনে নিয়ে আসতে হবে। এভাবেই আমরা তাকে তরুণ প্রজন্মের কাছে উপস্থাপন ও তাদের মনে তার জাগরণগুলো গেঁথে দিতে পারি। খানবাহাদুর আহছানউল্লার (র.) চৈতিকতাকে আমাদের সমাজ ও শিক্ষায় মাত্রা বেশি প্রতিফলিত করে তুলতে পারলে এটি হবে তার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা প্রদর্শনের বড় উপায়। কেননা, শিক্ষার মূল লক্ষ্যই হচ্ছে নৈতিমান ভালো মানুষ গড়ে তোলা। আজীবন তিনি সেই কাজটিই করেছেন। আমরাও যেন তার কাজ থেকে এই শিক্ষাটিই গ্রহণ করতে পারি।

● লেখক : অর্থনীতিবিদ ও সাবেক গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক

Link: https://www.ittefaq.com.bd/671648/%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%B9%E0%A7%8D%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%89%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A6%BE-%E0%A6%93-%E0%A6%A2%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%9F